Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 54
April–June, 2018

বাংলাদেশের জাতীয় পোশাক নির্ধারণ : ইসলামের আলোকে নির্দেশনা
Setting the National Dress Code of Bangladesh Guidelines from Islamic Perspective

Muhammad Nazmul Huda*
Md. Ammar Zakaria**

ABSTRACT

Clothing is the means of dressing up the human body and covering his private parts. And on the other hand, it also is an indication of his taste and personality. Moreover, along with personality, the dress also shows the person's or the society's ethnicity or culture. There are many different types of clothing. Different countries of the world have set national dress codes according to their culture and religious requirements. Even though we have crossed forty-seven years of independence, we have been unable to set up any national dress. Thus it is the demand of time to set up a comprehensive dress code for our beloved nation. This article emphasizes on this issue by exploring cultural and Islamic views. The researcher has followed the descriptive method.

Keywords: culture; national dress; clothing; religious dress; hijab.

* Muhammad Nazmul Huda is an Assistant Professor, Dept. of Sciences of Hadith & Islamic Studies, International Islamic University Chittagong, E-mail: nazmuliiucbd@gmail.com

** Md. Ammar Zakaria is a Masters student, Dept. of Da'wah & Islamic Studies, International Islamic University Chittagong, E-mail: ammarzakaria300@gmail.com

সারসংক্ষেপ

পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের দেহ সজ্জিত করা এবং সতর আবৃত করার মাধ্যম। আবার অন্যদিকে তা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম বাহনও। পোশাক মানুষের আভিজাত্যের প্রতীক হওয়ার পাশাপাশি তার বিশ্বাস ও মূল্যবোধেরও পরিচয় বহন করে। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির কিংবা জাতির ঐতিহ্যের নির্যাস, কিংবা সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি অনুভব করা যায়। স্থান-কাল ভেদে পোশাক নানা রকম হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনার সমন্বয়ে জাতীয় পোশাক নির্ধারণ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বৎসর পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত আমাদের কোন জাতীয় পোশাক নির্ধারণ করা হয়নি। দেশের মানুষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় চেতনার সমন্বয়ে এবিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা সময়ের অপরিহার্য দাবি। আলোচ্য প্রবন্ধে পোশাক বিষয়ে এ ভূখণ্ডের মানুষের ইতিহাস ও চেতনা বিশ্লেষণ পূর্বক জাতীয় পোশাক নীতির ব্যাপারে ইসলামের আলোকে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

মূলশব্দ : সংস্কৃতি; জাতীয় পোশাক; পোশাক; ধর্মীয় পোশাক; হিজাব।

ভূমিকা:

পোশাক মানব সভ্যতার এক অপরিহার্য উপকরণ। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সকল সভ্য মানুষ পোশাক ব্যবহার করে আসছে। পোশাক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। এতে মানুষের ব্যক্তি সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পোশাকই বলে দেয় তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচিবোধ আর সামাজিক অবস্থান। পোশাকই মানুষের পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন পেশার মানুষ যেমন বিচারপতি, পুলিশ, উকিল, সৈনিক, কর্মকর্তা কিংবা অফিস-আদালতের কর্মচারী নিজ নিজ ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় কর্ম সম্পাদন করে থাকে। বিভিন্ন ইউনিফর্ম পরিহিতদের একত্রে সমাবেশ ঘটলে যে কেউ তাদের পোশাক দেখে সহজে চিনতে পারেন। কারণ পোশাকই তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। অনুরূপ কোন জাতির ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছায়া ও সংস্কৃতির গতি প্রকৃতির ইংগিত পাওয়া যায় তাদের জাতীয় পোশাকে। তাই জাতীয় পোশাক জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। যদিও এটি নির্দিষ্ট কোন ধর্ম ও বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে না, তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অভিরুচিই মূলত এতে প্রতিভাত হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী মুসলিম, যদিও এখানে সকল ধর্ম ও মতের মাঝে চমৎকার ঐক্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। তবে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কূপমণ্ডুকতা কিংবা উগ্রতা নেই। জীবনের অন্যান্য দিকের মত এক্ষেত্রেও ইসলামের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী এবং মানব কল্যাণের চিরন্তন লক্ষ্যাভিসারী।

ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট কোন মাপের বা ডিজাইনের পোশাক বাধ্যতামূলক করে দেয়নি, তবে এমন কিছু শর্ত ও মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের পক্ষেই মেনে চলা সম্ভব। এ মুলনীতিগুলো অনুসরণ করে স্থান, কাল, পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুযায়ী যে কোন পোশাক পরা ইসলামে জায়িয। তাই পোশাক প্রশ্নে বল্গাহীনতা ও অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি কোনটাই কাম্য নয়। হিজাব ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান। একটি পবিত্র ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হিজাবের বিকল্প নেই। হিজাবের ক্ষেত্রেও ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। এর মাধ্যমেই ইসলাম নারীকে আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদায় উজ্জীবিত করে শালীনতা ও সম্ভ্রমের মুকুট পরিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে পোশাকের ইতিহাস, ক্রমবিবর্তন আলোচনা পূর্বক বাংলাদেশের জাতীয় পোশাক নির্ধারণ সম্পর্কে ইসলামের আলোকে একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

পোশাকের পরিচয়

পোশাক এর আরবী প্রতিশব্দ লিবাস لباس ও ইংরেজি প্রতিশব্দ Dress, raiment ইত্যাদি। আরবী 'লিবাস' শব্দটির বহুবচন 'লুবুসুন' (لبس) ও 'আলবিসাতুন' (ألبسة) (Mustafa et all 2004, 813)। পবিত্র কুরআনে 'লিবাস' শব্দটি প্রত্যক্ষ অর্থের পাশাপাশি রূপক অর্থে ও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

তারা যা করতো তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক। (Al-Qurān, 16:112)। অন্যত্র রাতকে 'লিবাস' বলা হয়েছে: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন লিবাস (পোশাক) স্বরূপ। (Al-Qurān, 25:47)।

তৃতীয় এক স্থানে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পোশাক সাব্যস্ত করা হয়েছে।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। (Al-Qurān, 01:187)।

পরিভাষায়, মানব দেহের আবৃতযোগ্য অঙ্গ আচ্ছাদন করা, প্রতিকূল আবহাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহকে নিরাপদ রাখা ও দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যে বস্ত্র পরিধান করা হয় তাকে পোশাক বলে।

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন, اللباس ستر العورات وهي السوأت 'পোশাক হলো সতর ঢাকার বস্তু, আর সতর বলা হয় গোপন অঙ্গসমূহকে (Al-Rafa'yī 1410H, 2/194)।

ড্রেসকোড হলো, লিখিত বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অলিখিত এমন কিছু নিয়মাবলি, যা পোশাক পরিচ্ছদের সাথে সম্পর্কিত। মানুষের রুচি, সংস্কৃতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, ফ্যাশন, সামাজিক রীতি, উপলক্ষ ও আবহাওয়ার সাথে এর

গভীর যোগসূত্র রয়েছে। আবার একটি মানুষকে প্রয়োজনের আলোকে একই দিনে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিবর্তন করতে হয়। যেমন বাসস্থানের পোশাক, কর্মস্থলের পোশাক, বিশেষ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পোশাক ইত্যাদি।

পোশাক ব্যবহারে ঐতিহাসিক বিবর্তন

ক. আদিযুগ

মানব সভ্যতার আদি পুরুষ আদম (আ:) থেকেই পোশাকের ব্যবহার ছিল। আদি মানবরা পোশাক হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাত পশুচর্ম, গাছের ছাল ও পাতা ব্যবহার করতো। তাদের সম্পর্কে নগ্নতা ও অসভ্যতার যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা পুরোপুরি সত্য নয়, হয়তো বিশেষ কোন জাতি বা অঞ্চলে এ জাতীয় নগ্নতা ছিল, যা বর্তমানেও আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়। এর অন্তরালে আদম (আ:) থেকে শুরু করে আগেকার সকল নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতদেরকে অসভ্য ও বর্বর প্রমাণের হীন উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতিকেই তাদের ন্যূনতম ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জ্ঞান দান করেছেন। পোশাক হিসেবে কাপড়ের বুনন ও ব্যবহার শুরু হয় ইদ্রীস (আ:) এর যুগ থেকে। বর্ণিত আছে,'সর্বপ্রথম ইদ্রীস (আ:) ই কাপড় সেলাই করেন এবং পরিধান করেন ('Alī 1971, 8/189)।' পরবর্তীতে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পোশাক হিসেবে কাপড়ের ব্যবহার প্রাধান্য পায়।

খ. ইসলামের প্রাথমিক যুগ

হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ স.এর যুগে আরব দেশে পুরুষরা সাধারণত ইযার (লুঙ্গি), পায়জামা, কামীস, আবা এবং মহিলারা সেলোয়ার, কামীস, জিলবাব, ওড়না পরিধান করতো। রাসূলুল্লাহ স. এর পোশাক সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর সাধারণ পোশাক ছিল ইযার, কামীস ও চাদর। তিনি ইয়েমেনের ডোরাকাটা চাদর পছন্দ করতেন, যাকে আরবীতে হিব্‌রা বলা হতো। রাসূলুল্লাহ স. ও কোন কোন সাহাবীর মধ্যে শামী আবা পরিধান করার প্রচলন ছিল। খুলাফা রাশিদূনের যুগেও মুসলিমগণ সামান্য পরিবর্তনসহ উপরোক্ত পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন (Jahangir 2007, 129-146)।

গ. উমাইয়্যা যুগে পোশাক

উমাইয়্যা যুগে মুসলিম সমাজে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা ছিল। তাই পোশাক পরিচ্ছদের ধরন ও বৈশিষ্ট্যেও এর প্রভাব পড়ে। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা রহ. প্রমুখ মুতরাফ (কারুকার্যখচিত রেশমী চাদর) পরিধান করতেন। সৌখিন স্বভাবের মানুষ অশ্বারোহনকালে গিলালা (অন্তর্বাস বিশেষ) ও চোস্ত-পায়জামা পরিধান শুরু করে দেয়। মরুবাসী বেদুঈন ও সাধারণ গ্রামবাসী সাদা জুব্বা, ডোরাকাটা ও হলুদ কুফিয়্যা (রুমাল বিশেষ) ব্যবহার করতো। সে সময় ফকীহ ও কাতিব (সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)-গণ মাথায় দীর্ঘ ও নীল পাগড়ী বাঁধা শুরু করেন। সাধারণ শ্রেণীর

লোকজন লাল রং এর সরু আগাবিশিষ্ট জুতা পরিধান করতো। শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ আতরমাখা চাদর (মুলাওয়া মুতাইয়াবা) ও পরিধান করতেন। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে উমাইয়া যুগে প্রচলিত পেশাভিত্তিক পৃথক পৃথক পোশাকেরও উল্লেখ রয়েছে (Lutfī & ‘Alī 1992, 84-85)।

ঘ. আব্বাসী পোশাক শৈলি

আব্বাসী যুগে জনসাধারণ মোটা কাপড়ের চাদর, কামীস ও লুঙ্গি পরিধান করতো। কোমরে পেঁচানোর কোমরবন্দ বা পটকার প্রচলন ছিল। কাঁধের উপরে চাদর ঝুলিয়ে রাখা হতো। বিশিষ্ট লোকজন উৎকৃষ্ট ও মসৃন কাতান দ্বারা প্রস্তুতকৃত ঢোলা কামীস, পাতলা গেঞ্জী, নেশাপুরী জুব্বা ও ইয়েমেনের সুতী চাদর ব্যবহার করতো। ইরানী পোশাকেরও প্রচলন ছিল। পুরুষের নিকট সাদা পোশাক ছিল প্রিয়। তৎকালে দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন বুরকান (কালো কম্বল) ব্যবহার করতেন। বিনোদনমূলক সভা-সমিতিতে রঙিন জামা, আম্বরে রঞ্জিত কামীস, রঙিন চাদর ও জাফরানী ইযার ব্যবহার দূষণীয় ছিল না। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীগণ খূরাসানী ও তাবারী চাদর, নিশাপুরী দোপাট্টা, সাদা ঢোলা সেলোয়ার ও কালো ওড়না পরিধান করতো। খলীফা হারুনুর রশীদ খোলা জুব্বা, কারুকার্য খচিত পাগড়ী ও বুটিকের লুঙ্গি পরিধান করতেন। সে যুগে কাপড় বুননের তাঁত ছিল খুরাসান, মিসর, কূফা, সূস প্রভৃতি স্থানে। সূসে যে রেশমী বস্ত্র তৈরি হতো তার নাম ছিল সূসী। অভিজাত শ্রেণীর লোক ঢোলা পায়জামা, কামীস, গিলালা (অন্তর্বাস বিশেষ) ও আবা (জুব্বা) পরিধান করতো। আমীর-উমারা ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ মোজাও পরিধান করতেন, যা সাধারণত পশম ও চামড়ার তৈরি ছিল। আব্বাসী আমলে সরকারী পোশাক ছিল কালো বর্ণের। দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য কালো পোশাক আবশ্যিক ছিল। আমীর উমারার স্ত্রীদের মাথায় থাকতো মুকুট জাতীয় টুটি, যা হীরা-জহরত ও মণি-মুক্তা খচিত থাকতো। আব্বাসী যুগে ইসলাম আরবভূখণ্ড ছাড়িয়ে অনারব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তীতে আরবীয় আজমী পোশাক শৈলির সংমিশ্রণ পরিদৃষ্ট হয় (Ibid, 86-89)।

ঙ. পারস্যের পোশাক

বাগদাদে আব্বাসী দরবারের প্রভাবে পারস্য তথা ইরানে স্থানীয় পোশাকের পাশাপাশি আরব রীতির কিছু পোশাক স্থান করে নেয়। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এখানে কাবা (আলখেল্লা বিশেষ), সেলোয়ার, লুঙ্গি ও পাগড়ীর ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে পোশাক শিল্পেও পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। ক্রমে মখমল ও স্বর্ণের তারে কারুকাজকৃত পোশাকও প্রস্তুত শুরু হয়ে যায়। কাশান ও ইস্পাহানেই অধিকাংশ বস্ত্রের কারখানা ছিল। মধ্যম ও উচ্চ বংশের নারীগণ হিজাব ব্যবহার

করতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন রকম রেশমী পোশাক ছিল, যা মুরশিদী, যারানাহ, সামীনাহ ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তীব্র শীতের সময় বিভিন্ন প্রকার চর্মজাত পোশাক পরিধান করা হতো। ইরানে কাজারী যুগ থেকেই ইংরেজদের পোশাক চালু হতে থাকে। রেজা শাহ পাহলবীর আমলে পাহলবী টুপির প্রচলন হয় এবং নারীদের হিজাব পরার হার কমে যায়, যদিও বিপ্লব পরবর্তী যুগে তাতে পরিবর্তন আসে।

চ. মিসরে আরব্য পোশাকরীতি

মিসর সর্বদাই আরবজাহানের জ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে মর্যাদা পেয়ে আসছে। আরব্য সংস্কৃতির তীর্থভূমি হিসেবে মিসরের খ্যাতি সর্বজন বিদিত। শাম, হিজায ও পশ্চিম আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের লোকজন এখানকার রেওয়াজ ও পোশাক-আশাকের ফ্যাশন অনুসরণ করতো। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত মিসরের জনসাধারণ সাদাসিধে পোশাকেই অভ্যস্ত ছিল। তারা পায়জামা, নীল মোটা সূতার লম্বা কামীস কিংবা জুব্বা পরিধান করতো। এই ধরনের জুব্বা গলা থেকে বক্ষ পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকতো। উলের জুব্বাকে বলা হতো ‘যাবূত’। শীতকালে এটি ব্যবহৃত হতো। জুব্বার উপর অনেকে সাদা বা লাল উলের পেটী বাঁধতো। তাতে টাকা-পয়সা রাখার জন্য পকেটও থাকতো। তাদের মাথায় থাকতো ক্ষুদ্রাকার সাদা টুপি এবং তার উপর তারবূশ (তুর্কী-টুপি)। দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন শুধু নীল বা খাকি কামীসেই সন্তুষ্ট থাকতো, যার আস্তিন সাধারণত খোলা হতো। শীতের সময় সাধারণ লোকেরা ‘আবায়া’ পরিধান করতো। এটি এক প্রকার সূতী পোশাক, যার উপর সাদা, নীল বা খাকি রঙের চওড়া ডোরা থাকতো। ‘দিফফিয়্যা’ নামক কালো বা গাঢ় নীল বর্ণের ঢিলাঢালা উলের জুব্বারও প্রচলন ছিল।

মিসরে বিভিন্ন রকমের পাগড়ী বাঁধা হতো। মুসলিম জনগণ ব্যবহার করতো গাঢ় যায়তুনী বর্ণের পাগড়ী। খ্রিষ্টান কিবতী ও ইহুদীদের মধ্যে কালো ও নিলাভ বর্ণের পাগড়ী। আলিম ও কবি-সাহিত্যিকগণ এক ধরণের চামড়ার পাগড়ী ব্যবহার করতেন, যাকে ‘মাক্‌লা’ বলা হতো। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মহিলারা কালো কারীব-এর কামীস ব্যবহার করতো। পায়জামা (শান্‌তিয়ান) হতো সাদা মলমল বা ছিটের। কামীসের উপর কাফতানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ওয়াস কোটের মতো এক প্রকার পোশাক পরিধান করা হতো। এর আস্তিন লম্বা হতো এবং বুক থেকে কোমর পর্যন্ত বুতাম লাগানো থাকতো। বক্ষবন্ধনী (Brassiere) ব্যবহারেরও প্রচলন ছিল, যাকে ‘আনতাবী’ বলা হতো। মাথায় থাকতো তাকিয়া বা তারবূশ এবং এর চারদিকে ছিটকাপড়, মলমল কিংবা কারীবের রুমাল পেঁচানো থাকতো। আমীর শ্রেণীর মহিলাগণ মাথার উপর মলমল বা রঙিন কারীবের বৃহৎ একখণ্ড বস্ত্র (ওড়না) রাখতো, যার দুই প্রান্ত সোনালি রঙের কাপড় দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। একে ‘তারহা’ বলা হতো। মহিলারা বহির্গমনকালে বোরকা পরিধানের প্রচলন ছিল, যা পা পর্যন্ত দীর্ঘ

হতো এবং শুধু চক্ষু খোলা থাকতো। হলুদ বা লাল রঙের মারাকাশী চামড়ার উঁচু হিলযুক্ত ও স্বর্ণের কাজ করা লেডিস জুতারও প্রচলন ছিল। কোন কোন জুতায় মুক্তাও জড়ানো থাকতো (Ibrahim 2007, 84-100)।

খ্রিষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে মিসরের শহরগুলোতে শার্ট, কোট-প্যান্ট ও তুর্কী টুপি ব্যবহারের রেওয়াজ শুরু হয়। তবে সাধারণ জনগণ শহর-পল্লী সর্বত্রই নীল বর্ণের সম্মুখ খোলা কামীস পরিধান করতো। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 'কাফতান' ও 'আবা' পরতেন।

ছ. পোশাকে তুর্কীধারা

তুরস্কে খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ওয়াসা কোটের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এর উপর আবা পরিধান করা হতো। আলিম-উলামা ও শিক্ষক শ্রেণীর লোকজন প্যান্ট সদৃশ পায়জামা পরিধান করতো। এসব পায়জামার উপর ঘের থাকতো এবং প্যান্টের ন্যায় বোতাম হতো। তুর্কী টুপির খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। তুর্কী টুপির উপর সাদা রঙের ছোট পাগড়ী থাকতো, যাকে আরবীতে 'লাফ্ফা' বলা হয় এবং একে উলামায়ে কিরামের বিশেষ নিদর্শন মনে করা হতো। খ্রিষ্টীয় বিশ শতকের সূচনাপর্বে তুর্কী নারীগণ গৃহাভ্যন্তরে পাশ্চাত্য পোশাক ব্যবহার শুরু করে দেয়। অবশ্য ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তারা প্রশস্ত রেশমী গাউন (Gown) পরিধান করতো, যা গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা এবং উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বুতাম লাগানো থাকতো। একটি রুমাল দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে শুধু চক্ষুদয় খোলা থাকতো। মোস্তফা কামাল পাশা ক্ষমতায় এসে খিলাফত ব্যবস্থা বাতিল করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চালু করে প্রাচীন রীতির পোশাক ব্যাবহার নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে ইউরোপীয় হ্যাট ঐতিহ্যবাহী তুর্কী টুপির স্থান দখল করে নেয় এবং সার্বিক পোশাকে ঐতিহ্যবাহী তুর্কীধারা বিলুপ্ত হতে থাকে। অবশ্য এরদোয়ানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান তুরস্ক পুনরায় নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে ফিরতে চেষ্টা করছে (Sangram 2011)।

জ. উপমহাদেশে পোশাকের বিবর্তন

বাংলাদেশসহ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় দুই হাজার বৎসর আগ থেকেই কাপড় ও পোশাক ব্যবহারের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খনন কার্যের ফলে সূতো কাটার ও বস্ত্রবয়নের ছোট ছোট কল ও কাপড় রং করার চৌবাচ্চার সন্ধান পাওয়া গেছে। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব (১৫০০-২৫০০) বছর আগে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও উপনিষদের প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে ভারতীয় গাঙ্গেয় সমভূমিতে পোশাক হিসেবে কাপড় ব্যবহারের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ন ও মহাভারতে বিখ্যাত পৌরাণিক নায়কদের বেশভূষা ও পোশাক পরিচ্ছদের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন ধর্মীয় কৃত্যে, উৎসবাদিতে, শিকার উপলক্ষে এবং নব বধুর সাজসজ্জাতে ব্যবহৃত পোশাকের

বর্ণনা। কালিদাসের (আনু. খ্রি পূ. ১ম/ খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতক) রচনাবলিতে শিকারের পোশাক, সন্ন্যাসীর পোশাক ও ভিক্ষুকের পোশাকের উল্লেখ রয়েছে। তার রচনায় 'চীনাংশুক' নামক রেশমী বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো- এ বস্ত্র চীন থেকে আনা হয়েছিল। এমন একটি সূক্ষ্ম কাপড়ের বিশেষ বর্ণনাও রয়েছে, যাতে জানা যায়, প্রাচীন কালে গাঙ্গেয় (বংগ) উপত্যকায় উৎপন্ন এ কাপড় ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যেত। বাংলাপিডিয়ার গবেষণায় একেই ঢাকার বিখ্যাত 'মসলিন' বলে দাবী করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সহ এ অঞ্চলের পোশাক সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায় দুই চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন (পঞ্চম শতক) ও হিউয়েন সাঙের (সপ্তম শতক) এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙের বর্ণনাতে যে পোশাকসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় তা দর্জি দিয়ে তৈরি বা সেলাই করা ছিল না। গ্রীষ্মকালের তাপ প্রতিরোধের জন্য অধিকাংশ মানুষ সাদা কাপড় পরতো। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও শরীরকে আচ্ছাদন করে কাঁধ ও মাথার উপর পর্যন্ত প্রসারিত থাকতো। পুরুষরা বয়নকৃত বা সূচিকর্মযুক্ত টুপি ও জপমালা পরতো (Asiatic Society 2005, 4/461)। ত্রয়োদশ শতকে বিজয়ের পর বাংলার পোশাক ও সংস্কৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন আসে। প্রাক-মুগল মুসলিম অভিযানকারীরা যেমন সুলতান ও খাঁনরা আঁটসাট পাতলুন, কোমরের দিকে সরু ও নিচের দিকে ক্রমশ প্রসারিত পূর্ণঘাগরা-সদৃশ আঁটো আস্তিনের একটি লম্বা কোট পরতো। কোমরের সাথে চিক্কন কাগজসহ চওড়া ফিতা বেঁধে রাখতো। মাথাকে বেষ্টন করে পাগড়ী বাঁধা থাকতো এবং পাগড়ীর কাপড় ছিল পাঁচ হাত লম্বা। সাধারণ মুসলমানদের পোশাক ছিল লুঙ্গি, পায়জামা, সাধারণ জামা, নিমা (খাটো জামা) টুপি, পাগড়ী ইত্যাদি। কাজী ও ধর্মীয় আলিম সম্প্রদায় ঢিলে আলখেল্লা জাতীয় পোশাক (ফরাজিয়াত) এবং আরবীয় পোশাকও পরতেন। অভিজাত মুসলিম মহিলারা সেলোয়ার, কামিজ, ওড়না ও মাঝে মধ্যে শাড়ি পরতেন। সাধারণ ও গরীব মহিলারা শুধু শাড়ি পরতেন। ১৫২৬ সালে সম্রাট মুহাম্মদ জালালুদ্দিন আকবর কর্তৃক দিল্লীর ক্ষমতা গ্রহণ করার পর এ অঞ্চলের পোশাক শৈলিতে মঙ্গোলীয় প্রভাব পড়তে থাকে। পশ্চিমা ও মঙ্গোলীয় প্রভাবজাত মুসলিম পোশাকের একটি উদাহরণ হলো আচকান বা শেরওয়ানি। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণভাবে হিন্দুদের এবং বিশেষ করে অভিজাত হিন্দুদের পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অভিজাত হিন্দুদের পোশাক-পরিচ্ছদে মুসলিম প্রভাব এত বেশি বিস্তার লাভ করেছিল যে, সে সময় উচ্চ শ্রেণীর একজন হিন্দু যদি তিলক কিংবা কানের দুল ব্যবহার না করতো, তাহলে তাকে একজন অভিজাত মুসলিম থেকে আলাদা করা খুবই কষ্টকর ছিল (Chakrabarti & Shahnewaz 1997, 77)। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সাধারণত ধুতি ও চাদর ব্যবহার

করতো। তারা 'অঙ্গরাখা' নামক হাঁটু পর্যন্ত লম্বা এক ধরনের জামাও পরতো। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা শুধু এক প্রস্থ ধুতি পরতো, যা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ ধুতি কোমরে নেংটির মত জড়ানো থাকতো। হিন্দু মহিলাদের সাধারণ পোশাক ছিল শাড়ি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম আগমনের পর থেকে মহিলাদের শাড়ি পরার ধরন পাল্টে যায়। মুসলিম মহিলারা শাড়ি পরার স্থানীয় রীতির সাথে বিদেশী রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শাড়ি পরার নতুন রীতি চালু করেন। তাই আধুনিক শাড়ি পরার পদ্ধতিকে মুসলিম ও হিন্দু রীতির অভিযোজন বলা যায়।
পরবর্তী যুগে এ অঞ্চলে পুরুষদের প্রিয় পোশাক হিসাবে সেলাই করা লুঙ্গি, পায়জামা, পাঞ্জাবী, ধুতি ও মহিলাদের ক্ষেত্রে শাড়ি ও ব্লাউজের ব্যবহার প্রাধান্য পায়। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে নারী ও পুরুষ উভয়ের পোশাক শৈলিতে পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে পুরুষরা পশ্চিমা রীতির শার্ট, প্যান্ট, স্যুট ও টাই পরতে শিখেছে। অন্যদিকে মেয়েরা আধুনিক ডিজাইনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। নব্বইয়ের দশক থেকে মেয়েদের পোশাকে একটি তাৎপর্যমণ্ডিত অন্তর্ভুক্তি হলো শাল। স্বাচ্ছন্দ্যময় পোশাক হিসেবে মেয়েরা থ্রিপিস পরছে। এই (থ্রিপিস) ত্রিখণ্ডিত পোশাক সকল বয়সের মেয়েদের কাছে জনপ্রিয়। বিবাহিত মেয়েদের জন্য একসময় নিষিদ্ধ সালোয়ার-কামিজ এখন বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীরা, গৃহবধূরা এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মেয়েরা পরছে। আরও অধিক কর্মমুখর বাইরের জীবনে কাজকর্ম ও চলাফেরার সুবিধার্থে মেয়েরা এই পোশাক গ্রহণ করেছে। সুতি শাড়ি ও সালোয়ার-কামিজে ছাপচিত্রের ধরনসমূহ, যেমন ব্লকপ্রিন্ট হাতের ও মেশিনের সূচিকর্ম, স্ক্রিন-ছাপ ইত্যাদি শৈলি বহুবিধ সুতি কাপড়ের উৎপাদন বাড়াচ্ছে।

পোশাক-ফ্যাশনে নিত্যদিন পরিবর্তন ঘটে। তবে পরিবর্তনের এ ধারা বর্তমানে আরো বেশি গতিশীল। প্রতিদিন নতুন নতুন ফ্যাশন ও ডিজাইনের পোশাক বের হচ্ছে। এসব নিয়ে গবেষণা করার জন্য বহু ফ্যাশন ডিজাইনার ও প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এসব সত্ত্বেও পায়জামা, পাঞ্জাবী ও সালোয়ার কামিজই এ অঞ্চলের মানুষেরা ঐতিহ্যবাহী ও জাতীয় পোশাক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব, অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এ পোশাককেই প্রাধান্য দেয়।

পোশাকে ধর্মীয় ও জাতিগত প্রভাব

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক এবং আদর্শিক জাতীয়তার গভীর ও সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। তাই বিশ্বব্যাপী অসংখ্য জাতি ও ধর্মের বিভক্ত মানুষের পোশাক শৈলিতে রয়েছে নানান বৈচিত্র্য। ধর্মীয় ঐতিহ্যের কারণে হিন্দু ঠাকুর ও ব্রাহ্মণরা ধুতি, পৈতা, খ্রিষ্টানরা ক্রুশচিহ্নিত পোশাক, ইহুদী পাদ্রীরা লম্বা জুব্বা এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গেরুয়া কাপড়ের পোশাক পরিধান করেন।

মুসলিম আলিমগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়জামা-পাঞ্জাবী, জুব্বা, কানজুরা, শেরওয়ানী, টুপি ও পাগড়ী পরেন। বিশেষত উপমহাদেশের মুসলিমগণ একে সাধারণত আলিমদের পোশাক বলে মনে করেন। আবার একই ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তার কারণে বাংলাদেশী মুসলমানদের পোশাক আরব, ইরান, তুরস্ক, আফগান ও ইউরোপের মুসলমানদের পোশাক থেকে ভিন্নতর। এভাবে একই দেশে বিভিন্ন উপজাতির পোশাক-পরিচ্ছদেও বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মরং, রাখাইন ইত্যাদি উপজাতিদের পোশাক শৈলিতে বেশ পার্থক্য রয়েছে। উপজাতীয়দের প্রধান পোশাকের মধ্যে রয়েছে চাকমাদের পিনন, খাদি মারমাদের থামি, ত্রিপুরাদের রিনাই রিসা, মুরংদের ওয়াঙলাই, গারোদের গেনা, সাঁওতাল মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পানচি ও পাড়াহান। এসব পোশাকের প্রতিটিই নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্যের আলোকে পরস্পর থেকে ভিন্নতর। বিশ্বব্যাপী পোশাক ভিন্নতার আরো কিছু মৌলিক কারণ রয়েছে। যেমন : লিঙ্গ পার্থক্য, অভিরুচির পার্থক্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, আঞ্চলিক সংস্কৃতি, আবহাওয়ার ভিন্নতা ও পেশার পার্থক্য। উপরোক্ত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানান রকম পোশাক পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে জাতীয় পোশাকের আবশ্যিকতা

পোশাক মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য বাড়াক আর না বাড়াক, পোশাক দেখে তাকে চেনা যায় কথাটি প্রাসঙ্গিক। সাংবাদিক কামাল লোহানীকে সর্বদা সাদা লুঙ্গি-পাঞ্জাবিতে এবং কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদকে সাদা লুঙ্গি-চাদরে দেখলেই বোঝা যায়, তারা একটি প্রতিজ্ঞা, একটি নীতি বা মূল্যবোধ ধারণ করছেন। এটা তাদের ট্রেডমার্ক বা ব্রান্ডিংও বলা চলে। এই পোশাক সমাজে তাদের বিশেষত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। বৃহত্তর বা বিশ্বপরিসরেও পোশাক দেখে মানুষ চেনা যায়। বিশ্বের সব দেশের মানুষ কোন মহাসমাবেশে জড়ো হলে তাদের দেখে বলে দেওয়া যাবে যে, কে কোন্ দেশের মানুষ, তবে এই কাজটি সহজ হয় যদি তাদের জাতীয় পোশাকে দেখা যায়। পৃথিবীর বহু দেশে জাতীয় পোশাক তাদের জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। এ পোশাক তারা সর্বক্ষণ না পরলেও বিভিন্ন উৎসব, পার্বণে আবেগ ও উৎসাহের সাথে পরিধান করেন। জাতীয় পোশাক না থাকলে একটি জাতির আন্তর্জাতিক প্রতিকী পরিচয়কে কঠিনতর করে দেয়, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। কারণ জাতীয় পোশাক বাহ্যিক রূপে হলেও একটি জাতির জাতীয় ঐক্যকে সংহত করে। তাই অন্যান্য জাতির মতো আমাদেরও একটি জাতীয় পোশাক নির্ধারণ হওয়া জরুরী। জাতীয় পোশাক কি হবে তা নিয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। দেশের বেশিরভাগ মানুষ লুঙ্গি-গেঞ্জি পরলেও শতকরা ৯০ ভাগ বা তারও বেশি মানুষ সামাজিকভাবে পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সে জন্য আমরা হয়তো

সব আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সমাবেশে পাজামা-পাঞ্জাবিই পরে যাব আর তাতেই আমাদের সহজে চেনা যাবে। কারণ, যতদূর জানি কোন দেশেরই জাতীয় পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি নয়। আমরা তাই সহজেই পাজামা-পাঞ্জাবিকে জাতীয় পোশাক হিসেবে ঘোষণা দিতে পারি। আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস, কৃষ্টি আর সভ্যতা ঘেঁটেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি কাজটি করার আগে একটি কমিটিকে সবকিছু ঘেঁটেঘুঁটে এই মর্মে একটি সিদ্ধান্ত দেওয়ার সুপারিশ করার দায়িত্ব দেওয়া যায়। জাতীয় পোশাক নির্ধারণ কমিটি গঠন করা যায়। কমিটি এই উদ্দেশ্যে একটি দ্রুত জরিপও চালিয়ে নিতে পারে। প্রথিতযশা সাংবাদিক কামাল লোহানী ৬ জানুয়ারি, ২০১৬ দৈনিক আমাদের সময়ে "পঁয়তাল্লিশ বছরেও রাষ্ট্রের কোন জাতীয় পোশাক কেন হলো না? শিরোনামে লিখেছেন, "আগেও বলেছি এখনো বলি, প্রস্তাব আকারেই বলি আমাদের দেশের সব ধর্ম-বর্ণ নাগরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য, বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একটি জাতীয় পোশাক নির্ধারণ করুন। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের এ পরিচিতি সংকট অবিলম্বে দূর করুন। আমাদের প্রস্তাব : অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় বিবেচনা করে পাজামা-পাঞ্জাবিকে জাতীয় পোশাক নির্ধারণ করা হোক।... শীতে শাল পরিধান করা যেতে পারে (Mohiuddin 2016)।"

বঙ্গবন্ধু জাতীয় ফল-ফুল, পশুপাখি ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু জাতীয় পোশাক ঘোষণা করেননি। কেন জানি না। প্রবল জনমত ছিল তার পোশাকটিই জাতীয় পোশাক হিসেবে ঘোষিত হোক। যে কোন বাংলাদেশি পুরুষকেই সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ও হাতাবিহীন কালো কোট পরলে স্যুট পরার তুলনায় সুন্দর, মর্যাদাবান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেখায়। পোশাকটি অবশ্যই জাতীয় পোশাক হতে পারে। নারীদের জাতীয় পোশাক হতে পারে থ্রি পিস। তারা মাথার উপর ওড়না পরতে পারেন। জাতীয় পোশাকের ব্যাপারে অনেকেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নানাভাবে শেয়ার করেছেন, এ ব্যাপারটির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে জাতীয় পোশাকের আবশ্যিকতার কথা সকলেই উপলব্ধি করছেন।

পোশাক পরিচ্ছদে ইসলামের মূলনীতিসমূহ

১. ইসলামে নিষিদ্ধ পোশাক ও ডিজাইনসমূহ

ক. পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক হারাম: স্বর্ণ ও রেশম অহংকার, গৌরব প্রকাশের একটি বিলাসী মাধ্যম। ইসলাম পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم

রেশমী পোশাক ও স্বর্ণ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম ও তাদের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে' (Al-Tirmidī 1417H, 1/302)।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে :

لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا ولم يلبسه في الآخرة

তোমরা রেশমী বস্ত্র পরো না। কারণ দুনিয়াতে যে রেশমী পরলো, আখিরাতে সে তা পাবে না (Ibn Daqīq ND, H-399)।

তবে হানাফী মাযহাবের মতে, বিশেষ প্রয়োজনে, যেমন কোন ব্যাথা বা চর্মরোগ নিরাময়ের জন্য অথবা সাধারণভাবে অনুর্ধ্ব চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়িয (Assaf 1988, 545)। কারণ রাসূলুল্লাহ স. যুবাইর ও আবদুর রহমান ইবনু আওফ রা. কে তাদের চর্মরোগের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন (Al-Bukhārī 2002, 2/561)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ স. দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের বেশি পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (Muslim 2006, 2/302)। বারা ইবনুল আযিব রা. বলেন;

أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذهب، وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج.

রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন, ১. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে ২. মৃতের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে ৩. হাঁচি প্রদানকারীর আলহামদু লিল্লাহ' বলার জবাবে 'ইয়ারহামকাল্লাহ' বলতে ৪. শপথ রক্ষা করতে ৫. মযলুমকে সাহায্য করতে ৬. দাওয়াত প্রদানকারীর ডাকে সাড়া দিতে এবং ৭. সালামের প্রচলন করতে। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন, স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে ২. রৌপ্যের পাত্রে পান করতে ৩. লাল রেশমী কাপড়ের তৈরি গদি ব্যবহার করতে ৪. রেশমের কাপড় ব্যবহার করতে ৫. রেশম পরিধান করতে ৬. কারুকার্যখচিত রেশমী পোশাক পরতে এবং ৭. রেশম দিয়ে বুনন করা কাপড়ের পোশাক পরিধান করতে (Al-Bukhārī 2002, 5/2202)।

পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক দু'টি কারণে হারাম হতে পারে। এক. এটিকে পুরুষের কঠিন শ্রম ও সংগ্রামী জীবন যাপনের পরিপন্থী গণ্য করা হয়েছে। দুই. ইসলামের সর্বজনীন সাম্যের দৃষ্টিতে পোশাকের সে মানকে পছন্দ করা হয়েছে, যা একজন সাধারণ মানুষের জন্যও সহজলভ্য। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানেও পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে (Ahmad 'Ali 2005, 18)।

খ. নারী-পুরুষ পরস্পরের পোশাক পরা হারাম : নারী-পুরুষের জন্য একে অপরের বেশভূষা গ্রহণ করা হারাম। কারণ নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাদৃশ্য অবলম্বন একটি অস্বাভাবিক আচরণ ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার আলামত। এটি তাৎক্ষণিক ভাবে নারী-পুরুষচিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি করতে পারে। যারা এ ধরনের

বেশভূষা পরিধান করে রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় অভিসম্পাত করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل

রাসূলুল্লাহ স. এমন সব পুরুষের উপর অভিসম্পাত করেছেন, যারা নারীসুলভ পোশাক পরিধান করে এবং এমন নারীকেও অভিসম্পাত করেছেন, যারা পুরুষসুলভ পোশাক পরিধান করে (Abū Daūd 1420H, 2/559)।

ইবনু আব্বাস রা. থেকেও এ ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি হাদিসে তিনি আরো বলেন :

لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من دياركم

রাসূলুল্লাহ স. হিজড়া বেশধারীপুরুষ ও পুরুষের বেশধারী নারীদের উপর লা'নত করেছেন। তিনি বলেন, এদেরকে তোমরা ঘর থেকে বের করে দাও (Al-Bukhārī 2002, 2/874)।

আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. একদিন উম্মু সাঈদ বিনতে আবী জেহেলকে কাঁধে ধনুক ঝুলিয়ে পুরুষালি ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখেন। তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছি:

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال

যে নারী পুরুষদের অনুকরণে সাজসজ্জা বা চালচলন করে এবং যেপুরুষ নারীদের অনুকরণে সাজসজ্জা করে তারা আমাদের মধ্যে গণ্য নয় (Ahmad ND, 2/199)।'

অর্থাৎ সর্বজনীনভাবে পরিচিত পুরুষের পোশাক বা ডিজাইন ব্যবহার করা মহিলাদের জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ মহিলাদের স্বীকৃতি পোশাক ব্যবহার করা পুরুষের জন্যও বৈধ নয়। বিপরীত লিঙ্গের পোশাক ব্যবহার এত কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে, এটা প্রকৃতির শুদ্ধ ধারার প্রতি বিদ্রোহের শামিল। এটি কোন সুস্থ সভ্যতার পরিচায়ক হতে পারে না।

গ. অমুসলিমদের ধর্মীয় পোশাক : অমুসলিমদের ধর্মীয় পরিচয়সূচক পোশাক পরা হারাম। প্রচলিত ধর্মীয় পোশাকের মধ্যে রয়েছে হিন্দুদের ধূতি, ব্রাহ্মণদের পৈতা, হিন্দু সাধুদের গৌরি পোশাক, বৌদ্ধদের গেরুয়া কাপড়ের তৈরি পোশাক, খ্রিষ্টান পাদ্রীদের আলখেল্লা, ক্রুশ চিহ্নিত পোশাক ইত্যাদি। এগুলো বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় পোশাক হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। কোন মুসলিম এসব পোশাক গ্রহণ করতে পারে না। আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

من تشبه بقوم فهو منهم

'যদি কেউ অন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ হয়, তবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত (Abū Daūd 1420H, 2/559)।'

মুহার্‌রমের রোযায় ইহুদীদের বিপরীত করা প্রসংগে নবী স. আরো বলেন,

خالفوا اليهود صوموا التاسع والعاشر

তোমরা ইহুদীদের ব্যতিক্রম করো। নবম ও দশম দিন রোজা রাখ (Al-Hākem 1999, 1/260)।

সুতরাং অমুসলিমদের প্রার্থনা বা ইবাদাতের সাথে মুসলমানদের ইবাদাত হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না এবং তাদের উল্লেখিত স্বীকৃত ধর্মীয় পোশাক মুসলমানদের গ্রহণ করা বৈধ নয়। উল্লেখ্য, যেসব পোশাক সাধারণভাবে সকল ধর্মের অনুসারীরা পরে এবং যে পোশাক নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচয় বহন করে না, তা ধর্মীয় পোশাক হিসাবে গণ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ লুঙ্গি, পাঞ্জাবী শার্ট, প্যান্ট, কোট, গেন্‌জি, চাদর, শেরওয়ানী ইত্যাদি।

ঘ. অতিরিক্ত মিহি ও পাতলা কাপড় : মিহি ও পাতলা বলতে ঐ সমস্ত কাপড় বুঝানো হয়েছে, যা পরার পর নগ্ন মনে হয় এবং চামড়ার রং প্রকাশ পায়। নারী-পুরুষের উভয়ের জন্য এ জাতীয় কাপড় পরা হারাম। কারণ এসব কাপড় পোশাকের উদ্দেশ্য পূরণ করে না। তবে মহিলাদের জন্য ঘরের মধ্যে যদি স্বামী ছাড়া অন্য কেউ দেখার সম্ভাবনা না থাকে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের কাপড় পরা বৈধ। এসব কাপড় পরে নামাজ পড়লে শুদ্ধ হবে না (Ahmad 'Alī 2005, 40)। তেমনি সেই কাপড় ব্যবহার করাও মাকরূহ, যা পরলে গুপ্তাঙ্গ দেখা যায় না বটে; কিন্তু তার বডি আউট লাইন (শরীরের আকৃতি/ গড়ন) বা বডি প্রোফাইল (শরীরের বাঁকসমূহ) বাইরে থেকে ফুটে ওঠে। রাসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেন :

ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها

অনেক নারী এমন পাতলা কাপড় পরিধান করে, যা উলংগ থাকারই শামিল। তারা জান্নাতে প্রবেশ তো দূরের কথা, ঘ্রাণও পাবে না (Muslim 2006, 2128)।

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, একবার তার বোন আসমা বিনত আবু বকর রা. রাসূলুল্লাহ স. এর দরবারে পাতলা কাপড় পরে প্রবেশ করলেন। রাসূল স. তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার চেহারা ও হাতের দিকে ইংঙ্গিত করে বললেন :

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه

হে আসমা, কোন মেয়ে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তার এ অঙ্গ ও এ অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই পরিদৃষ্ট হওয়া বৈধ নয়, এ কথা বলে তিনি নিজের মুখমণ্ডল ও করতলের দিকে ইঙ্গিত করেন (Abū Daūd 1420H, 3580)।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আসমা রা. এর পরিধেয় বস্ত্র পাতলা হওয়ার কারণে তার শরীরের রং ও গঠন প্রকাশ পেয়েছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ স. তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার হাফসা বিনত আবদুর

রহমান রা. একটি পাতলা ওড়না পরে আয়িশা রা. এর নিকট আসলেন। আয়িশা রা. তখন ওড়নাটি ছিঁড়ে ফেলে তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন (Al-Baihaqī 2003, 2/235)।

সুতরাং বুঝা গেল, কাপড় অতিরিক্ত মসৃণ ও পাতলা হওয়ার কারণে যদি শরীরের রং প্রকাশ পায়, তা পরা জায়েয নেই। আর এ বিষয়টি নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উল্লেখ্য, শরীরের যে অংশ আবৃত করা ফরয তা ব্যতীত অন্য অংশের জন্য পাতলা কাপড় ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। কোন কোন সাহাবী-তাবিয়ী পুরুষের কামীস, চাদর ও পাগড়ীর ক্ষেত্রে পাতলা কাপড়ের ব্যবহারে আপত্তি করেননি।

ঙ. আঁটসাঁট পোশাক: আঁটসাঁট ও স্কীন টাইট পোশাক পরলে শরীরের গঠন ও বাঁকসুমূহ স্পষ্ট বুঝা যায়। এটা শালীনতার পরিপন্থী এবং তা মহিলাদের হিজাব বান্ধব নয়। এ ছাড়া স্বচ্ছন্দে চলাফেরা, সহজে প্রশ্রাব-পায়খানা করা এবং সঠিকভাবে নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও এ ধরনের পোশাক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই শরীরের সাথে লেপ্টে থাকা টাইট প্যান্ট, শর্ট কামিজ ও বিভিন্ন ধরনের টেডি পোশাক পরে জনসমক্ষে আসা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ স. সব সময় ঢিলেঢালা পোশাক পরতেন। মুয়াবিয়া ইবন কুর্‌রা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: 'একদা আমি মুযায়না গোত্রের লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহর স. দরবারে আসলাম। তারা রাসূল স.-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহর স. জামার বুতাম খোলা ছিলা। এমতাবস্থায় আমি আমার হাতখানা তার জামার মধ্যে ঢুকিয়ে মোহরে নুবুওয়াত স্পর্শ করলাম (Abū Daūd 1420H, 2/564)। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ স. এর জামা যথেষ্ট ঢিলেঢালা ছিল।

দাহ্‌ইয়া ইবন খলিফা আল-কালবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক সময় রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে কয়েকটি কিবতি কাপড় (আঁটসাঁট মোটা কাপড়) আনা হলো। তিনি তা থেকে একটি কাপড় আমাকে দিয়ে বললেন: একে দুই ভাগ করে নাও। একভাগ দিয়ে তোমার জামা তৈরি কর, আর অন্যটি ওড়না হিসেবে তোমার স্ত্রীকে দান কর। আমি চলে যেতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ স. বললেন :

وأمر إمرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها

তোমার স্ত্রীকে নির্দেশ দিবে, যেন এর নীচে অন্য আরেকটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীর দেখা না যায় (Abū Daūd 1420H, 4116)।

উমর রা. কিবতি কাপড় পরতে মহিলাদের নিষেধ করতেন। কারণ, এসব কাপড়ের বৈশিষ্ট্য হলো, শরীরের সাথে লেপ্টে থাকা, যা অশোভন।

চ. ব্যতিক্রমধর্মীও অহংকারসূলভ পোশাক: পোশাক সর্বক্ষণ মানুষের দেহ আবৃত

করে রাখে। পোশাকের মধ্যে অহংকারের প্রকাশ থাকলে তা মানুষের হৃদয়কে সংক্রমিত করে এবং অহমিকা ভাব জাগিয়ে তোলে। এজন্য ব্যতিক্রমধর্মী ও অহংকারসূলভ পোশাক পরিধান করতে হাদীসে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যে ধরনের পোশাক পরলে জনসাধারণ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র কেউ হিসেবে প্রকাশ পায় এবং যে পোশাকের কারণে তার অহংকার জাহির হয়, তাই ব্যতিক্রমধর্মী অহংকার সূলভ পোশাক। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة

যে ব্যক্তি খ্যাতির পোশাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার পোশাক পরিয়ে দিবেন (Ibn Mājah 2014, 2/257)।

ইবন আব্বাস রা. বলেছেন :

كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك ثنتان سرف أو مخيلة

তুমি যা ইচ্ছা খাও ও পরিধান কর, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'টি জিনিস থেকে তুমি ভুলে থাকবে- অপচয় ও গর্ব অহংকার প্রকাশক বস্ত্র (Alī Qārī 2002, 4380)।

উল্লেখ্য যে, উৎকৃষ্ট ও দামী কাপড়ই শুধু ব্যতিক্রম ও অহংকারের প্রতীক নয়; বরং অনেক সময় নিকৃষ্ট ছেঁড়া সস্তা মানের কাপড়ও এ কাজে ব্যবহৃত থেকে পারে। যেমন কোন দরবেশ যদি প্রচলিত কাপড়ের ব্যতিক্রম কোন নিম্নমানের পোশাক দরবেশী প্রকাশার্থে পরিধান করেন, তবে তাও জায়িয নয়। ইবন তাইমিয়া (রহ.) বলেন : খ্যাতিজনক পোশাক হলো, সাধারণ্যে প্রচলিত উৎকৃষ্ট কাপড় আর সাধারণ্যে অপ্রচলিত নিম্নমানের কাপড়। সালাফ সালিহীন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দু'ধরনের পোশাকের খ্যাতিই অপছন্দ করতেন (Ibn Taimiyyah 1995, 22/138)। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ স. দু'ধরনের খ্যাতি অর্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ খ্যাতি দু'টি কি কি? তিনি বললেন :

رقة الثياب وغلظها، وليّنها وخشونتها، وطولها وقصرها، ولكن سداداً بين ذلك واقتصاداً

তা হলো, কাপড় অতিমিহি হওয়া বা মোটা হওয়া, কোমল হওয়া বা খসখসে হওয়া এবং লম্বা হওয়া বা বেটে হওয়া। এগুলোর মাঝেই হলো সঠিক ও মধ্যপন্থা (Al-Tirmidī 1417H, 5/372)।

সুতরাং বুঝা গেল, ইসলাম সমর্থিত পোশাকও ব্যতিক্রমধর্মী বা খ্যাতির প্রবণতা থাকলে হারাম হয়ে যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এ শর্তটি সমভাবে প্রযোজ্য। মানুষের দৃষ্টি কাড়ে এমন জামা-কাপড়, এমনকি ওড়না এবং বোরকাও মু'মিন নারীদের জন্য পরা উচিত নয়। বর্তমানে অনেক সৌন্দর্য পিয়াসিনী মুসলিম নারীদের দেখা যায়, তারা ঘর থেকে হওয়ার সময় রকমারী চিত্রাংকিত রেশমী কাপড়ের বা অত্যন্ত উজ্জ্বল ঝকঝকে দামী কাপড়ের বোরকা পরে থাকেন, যাতে তাদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী হয়।

অথচ আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ মহিলারা যাতে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (Al-Qurān, 24:31)

তাই পর্দার নামে এ ধরনের উজ্জ্বল ও দৃষ্টি নন্দন বোরকা পরার অনুমতি ইসলামের নেই। মাওসূয়াতু ফিকহে উমর র. গ্রন্থে হিজাবের শর্ত উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে:

لا يكون زينة في نفسه يلفت الأنظار إليه

হিজাবের জন্য যে কাপড় ব্যবহার করা হবে তা যেন সৌন্দর্যের দিক থেকে এমন না হয় যে, সৌন্দর্য ঢাকতে গিয়ে নিজেই সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে (Qal'ajī 1989, 343)।

এখানে লক্ষণীয়, ইসলামে যেমন প্রসিদ্ধি ও অহংকারের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছে, তেমনি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোশাক পরিধান করতেও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

ছ. জীব-জন্তুর ছবি সম্বলিত পোশাক : ইসলামে যাবতীয় শিরকের মূলোৎপাটন করার লক্ষ্যে শিরকের উৎসগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিরক প্রসারের অন্যতম মাধ্যম প্রতিকৃতি বা ছবি। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কল্পিত অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করে মানুষ বিভিন্ন প্রাণী ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের ছবি তৈরি করে তাদেরকে পূঁজা করেছে। এ কারণে সকল প্রাণীর ছবি আঁকা, ব্যবহার, টাঙ্গানো বা পোশাকে বহন করা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। জীব-জন্তুর ছবি আঁকা এবং সে ছবি সম্বলিত পোশাক পরা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ স. বলছেন:

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة

ফেরেস্তাগণ এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যেখানে জীবন্ত কুকুর ও (প্রাণীর) ছবি রয়েছে (Al-Bukhārī 2002, 2/880)।

আয়িশা রা. অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেন, একবার তাঁর ঘরের দরজায় চিত্রাংকিত পর্দা দেখে রাসূল স. অসন্তুষ্ট হলেন এবং পর্দাটি ছিঁড়ে ফেলে বললেন:

إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون

কিয়ামতের দিন কঠিনতম শাস্তি ভোগ করবে যারা ছবি অংকন করে (Al-Bukhārī 2002, 5644)।

সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীসে আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন: 'আলী রা) আমাকে বলেন: আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ স. আমাকে প্ররণ করেছিলেন। যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেংগে গুড়িয়ে দিবে, (অতিরিক্ত) উঁচু কবর দেখলে তা সব সমান করে দিবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে (Muslim 20062, 2/666)।'

হাদীসে ছবি মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ছবি কাপড় বা পোশাকে থাকলে তাও মুছে ফেলতে হবে।

আয়িশা রা. বলেন: নবী করীম স. তাঁর বাড়িতে ছবি, ক্রুশ চিহ্ন বা ক্রুশের ছবি সম্বলিত কোন কিছু কাপড়, পর্দা যাই হোক না কেন তা রাখতে দিতেন না, খুলে ফেলতেন বা (ছবির অংশটুকু) কেটে ফেলতেন (Al-Bukhārī 2002, 5/2220)।'

উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, যেকোন ধরনের প্রাণীর ছবি/চিত্র সম্বলিত পর্দা, চাদর বা পোশাক ব্যবহার হারাম। অবশ্য মাথাবিহীন প্রাণীর চিত্র ব্যবহার করা বৈধ। এ ছাড়া গাছ-পালা পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতির চিত্র সম্বলিত কাপড় পরতেও বাধা নেই।

২. পোশাক পরিচ্ছদের দৈর্ঘ্য

পুরুষের জন্য টাখনু পর্যন্ত সীমানা। পায়ের গোড়ালির উপরে সামান্য উঁচু হয়ে থাকা হাড়টিকে আরবীতে কা'ব (كعب) ও ফার্সীতে টাখনু বলা হয়। উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে স্থানটি টাখনু নামেই বেশি পরিচিত।

হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত প্রায় এক হাত লম্বা স্থানকে আরবীতে সাক (ساق) বলা হয়। ইংরেজিতে shank এবং বাংলায় একে পায়ের নলা বলা হয়। রাসূলুল্লাহ স. অহংকারবশত টাখনু আবৃত করে পোশাক করিধান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মানুষকে দেখানো কিংবা গর্ব-অহংকারের উদ্দেশ্যে পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর নীচে ঝুলানো হারাম। পরিধেয় বস্ত্রের ঝুল কতখানি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীসে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ

ঈমানদার লোকদের ইজার পায়ের দুই নলার মাংসপেশী পর্যন্ত, অতঃপর দুই নলার মাঝ বরাবর ঝুলতে পারে। এর নীচে যেতে পারে পায়ের গিরা পর্যন্ত। এর নীচে গেলে তা জাহান্নামে যাবে (Al-Haythamī 1994, 5/123)।

হাদীস ইজার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে পরিধেয় বস্ত্র, যা কোমরের নীচের দিক ঢাকার জন্য পরা হয়। তা লুঙ্গি হতে পারে, পায়জামা হতে পারে, প্যান্ট হতে পারে, জুব্বা বা অন্য কিছু। এগুলো টাখনু গিরার নীচে ঝুলানো বৈধ নয়। ইবন উমর রা থেকে বর্ণিত : 'যে ব্যক্তি অহংকারবশত ইযার ঝুলিয়ে চলবে, তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আর সে কিয়ামত পর্যন্ত যমীনের ভিতরে তলিয়ে যেতে থাকবে (Al-Bukhārī 2002, 2/861)। যদি কারো অনিচ্ছাবশত লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি নীচে ঝুলে যায়, তবে তা এ হুকুমের আওতায় পড়বে না। ইবন উমর রা. অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :'যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে ফিরে তাকাবেন না। তখন আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অসাবধানতাবশত অনেক সময়

আমার ইযার ঝুলে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি তাদের মধ্যে নও যারা অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে (Al-Bukhārī 2002, 2/860)।'

মহিলাদের জন্য পায়ের নলার মাঝখান থেকে এক বিগত পরিমাণ পর্যন্ত কাপড় লম্বা করা মুস্তাহাব এবং এক হাত পরিমাণ লম্বা করা জায়িয। এর বেশি লম্বা করা উচিত নয় (Ahmad 'Alī 2005, 33)।

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ পোশাকের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক. পোশাকের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন

পোশাকের মূল উদ্দেশ্য দেহকে এমনভাবে আবৃত করা, যাতে তাকওয়া ও ভদ্রতা ফুটে ওঠে, শীতে ঠাণ্ডা ও গরমের উত্তাপ থেকে বেঁচে থাকা সহজতর হয়।

খ. পরিচ্ছন্নতা

ইসলাম পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকতেন। কাউকে অপরিষ্কার ও অগোছালো দেখলে আপত্তি করতেন এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত,

أتانا رسول الله ﷺ زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه ؟ ورأى رجلا عليه ثيابا وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟

রাসূলুল্লাহ সা. (একদিন) আমাদের নিকট আগমন করেন। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার মাথার চুলগুলো ময়লা ও এলোমেলো। তিনি বললেন, 'এই ব্যক্তি কি কিছুই পেলো না, যা দিয়ে সে তার চুলগুলো পরিপাটি করবে? তিনি আরেকজনকে দেখেন, যার পরনে ছিল ময়লা পোশাক। তিনি বলেন, এই ব্যক্তি কি একটু পানিও পায় না, যে তার পোশাক ধুয়ে পরিষ্কার করবে? (Abū Daūd 1420H, 4/51)

আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সুন্দর পোশাক পরিধান করা কি অহংকার বলে গণ্য হবে? তিনি বললেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ অর্থাৎ,'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন (Al-Hākim 1999, 1/78)।'

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الإسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف

ইসলাম পরিচ্ছন্ন। অতএব তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (Al-Haythamī 1994, 5/132)।

এভাবে রাসূলুল্লাহ স. অহংকার ও সৌন্দর্যের মধ্যে পার্থক্য শিখিয়েছেন। অহংকার হলো মনের অনুভূতি। যাবতীয় অহংকার থেকে হৃদয়কে মুক্ত রেখে সুন্নাহ অনুমোদিত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরাই ইসলামের শিক্ষা।

গ. সাদাসিধে ও বিনয় প্রকাশ

সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্য জাঁকজমক ও চাকচিক্যের প্রয়োজন নেই, সাদাসিধে ও বিনয় ছিল রাসূলুল্লাহ স. এর পোশাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি একদিকে যেমন সরলতা ও বিনয়কে ভালবাসেন, অপরদিকে ভণিতা বা কৃত্রিমতা, প্রকাশমুখি সরলতা ও অহমিকার নিন্দা করেছেন। ইসলামের শিক্ষা হলো, মুমিনের হৃদয় বিলাসিতা, মর্যাদা বা প্রসিদ্ধি প্রয়াসী নয়। প্রয়োজন ও সুযোগ অনুযায়ী মূল্যবান পোশাক পরিধান করলে মুমিন হৃদয় উদ্বেলিত বা অহংকারী হয় না। আবার মূল্যবান পোশাকের অভাব মুমিনের হৃদয়ে কোন আফসোস বা কষ্টের অনুভূতি সৃষ্টি করে না। সাধারণ পোশাক পরিধান করলেও মুমিনের হৃদয়ে এনিয়ে কোন হীনমন্যতা তৈরি হয় না। ইসলামী পোশাক শৈলি অতি উৎকৃষ্ট ও অতি নিকৃষ্টের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মুয়ায ইবন আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ের উদ্দেশ্যে সাধ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও (বেশি দামি) পোশাক পরিত্যাগ করে, মহিমাময় আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং ঈমানদারদের জান্নাতী পোশাক পরিচ্ছদের মধ্য থেকে যে পোশাক সে চাইবে তা বেছে নিয়ে পরিধান করার সুযোগ তাকে করবেন (Al-Tirmidī 1417H, 4/650)।

রাসূলুল্লাহ স. সাহাবীগণ সাধারণ পোশাক পরতেন। উমর (রা.) এর পোশাক সম্পর্কে আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, 'উমর রা. যখন খলিফা ছিলেন সে সময় আমি তাকে দেখেছি যে, তিনি তার পোশাকটি দু'কাধে তিন তালি দিয়ে নিয়েছেন। একটির উপর আরেকটি তালি দিয়েছেন (Mālik 1406H, 2/918)।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর পাশাপাশি এটিও মনে রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ স. প্রয়োজন ও সুযোগ অনুযায়ী মূল্যবান পোশাক পরিধান করতে মোটেও নিষেধ করেননি। তবে পোশাক জৌলুসকে আকাঙ্ক্ষার বস্তুতে পরিণত করাই দূষণীয়।

ঘ. আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন

আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ করা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অংশ, তাই আল্লাহ যদি কাউকে সম্পদ দ্বারা অনুগ্রহ করেন, তবে তার পোশাক-পরিচ্ছদেও সেই অনুগ্রহের কিছুটা প্রকাশ থাকা চাই। কেননা, ইসলাম সাদাসিধে ও বিনয় প্রকাশক পোশাকের প্রতি উৎসাহ প্রদান করার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় কৃপণতাকে অপছন্দ করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন হাদীসে এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ইমরান ইবন হুসাইন রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عبده

আল্লাহ যদি কাউকে কোন নিয়ামত দান করেন, তাহলে তিনি ভালবাসেন যে, তাঁর নিয়ামতের প্রভাব বান্দার উপর প্রকাশিত হোক (Al-Haythamī 1994, 5/132)।

অন্য একটি হাদীসে আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه ويكره البؤس والتباؤس

মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে কোন নিয়ামত দান করেন তাকে তিনি ভালবাসেন যে, তাঁর নিয়ামতের প্রভাব উক্ত বান্দার উপর (তার পোশাক ও বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে) প্রকাশিত হোক। পক্ষান্তরে তিনি অপমান ও দারিদ্র্য এবং এগুলোর ইচ্ছাকৃত প্রকাশ অপছন্দ করেন (Al-Baihaqī 1423H, 5/163)।

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন,

خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض مغازيه فخرج رجل في ثوبين منخرقين يريد أن يسوق بالإبل فقال له رسول الله ﷺ : "ما له ثوبان غير هذا؟ " قيل: إن في عيبته ثوبين جديدين. قال: "إيتوني بعيبته" ففتحها فإذا فيها ثوبان فقال للرجل: "خذ هذين فالبسهما وألق المنخرقين ففعل...أليس هذا خيرا.

'আমরা রাসূলুল্লাহ স. এর সাথে এক যুদ্ধে গমন করি, এক ব্যক্তি দু'টি ছেড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের উটসমূহ পরিচালনা করা। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, এই দু'টি কাপড় ছাড়া তার কি আর কোন কাপড় নেই? বলা হলো, তার ব্যাগের মধ্যে দু'টি নতুন কাপড় রয়েছে। তিনি বললেন, তার ব্যাগটি নিয়ে এসো। তিনি ব্যাগটি খুলে দেখলেন, তাতে দু'টি নতুন কাপড় রয়েছে, তখন তিনি বললেন, এ দুটো পরিধান করো এবং ছেঁড়াকাপড় দু'টি ফেলে দাও। লোকটি তাই করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ স. বলেন, এটা কি উত্তম নয়?! (Al-Hākim 1999, 4/203)

উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক মুসলমানদের উচিৎ, অবহেলাজনিত অপরিপাটিতা ও এলোমেলোভাব পরিহার করে পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও আর্থিক অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ মূল্যের পোশাক পরিধান করা। তবে সামঞ্জস্য বিধান অবশ্যই ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী হবে। কোন সমাজে যদি ধনী বা সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্যে রেশমী পোশাকের প্রচলন থাকে, তাহলে কোন ধনী বা সম্মানী মুমিনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অজুহাতে রেশমী পোশাক পরিধান করা বৈধ হবে না। মুমিন ইসলামের নির্দেশনার মধ্য থেকেই নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে। এসব ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। বিনয়, সৌন্দর্য কিংবা আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকাশ কোনটিতেই সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।

৪. পোশাকের ডিজাইন ও কাটিং পরিবর্তনশীল

পোশাকের ডিজাইন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সরাসরি কোন নির্দেশ নেই। পোশাক বিষয়ক আয়াতগুলোর মূল কথা হলো, পোশাক মানুষের লজ্জাস্থান আবরণকারী, সৌন্দর্য বর্ধক এবং তাকওয়ার প্রতীক হবে। এ পর্যায়ে হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে বুখারী শরীফের কিতাবুল লিবাস-এ উদ্ধৃত হাদীসগুলো যাচাই করলে দেখা যায়, সেখানেও পোশাকের ডিজাইন ও কাটিং সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা

আরোপ করা হয়নি। শুধু দু'টি বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। পোশাকের নামে অপচয় ও অহংকার বর্জন করতে হবে। নবী করীম স. বলেছেন :

كُلْ مَا شِئْتَ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.

তুমি যা ইচ্ছা খাও, যা ইচ্ছা পরিধান কর- যতক্ষণ পর্যন্ত দু'টো বিষয় থেকে তুমি ভুলে (দূরে) থাকবে: অপচয় ও গর্ব অহংকার প্রকাশ (Al-Bukhārī 2002, 2/860)।

সুতরাং বুঝা গেল, এ দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত যেকোন পোশাকই হাদীস মোতাবেক তৈরি করা এবং পরিধান করা বৈধ। পোশাকের ডিজাইন, কাটিং ও লম্বা-খাটোর ব্যাপারে হাদীস থেকে বিশেষ কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, কোন নির্দিষ্ট ডিজাইনের পোশাক সারাবিশ্বের সকল মানুষের জন্য উপযোগী হতে পারে না। পোশাক এমন এক জিনিস, যা সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। তদুপরি বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে এর সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গরম ও শীত প্রবণ এলাকার পোশাক একই রকম হতে পারে না। তেমনি পেশার ভিন্নতার কারণেও পোশাকের ধরন ও ব্যবহার ভিন্ন হতে বাধ্য। যেমন কারখানার শ্রমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মাঠের কৃষক, রিক্সা চালক, মসজিদের ইমাম, জেলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সবার জন্য একই ধরনের পোশাক উপযোগী হওয়া অসম্ভব। ইসলাম যেহেতু সমগ্র মানবজাতির জীবনাদর্শ, তাই এতে সকলকে নির্দিষ্ট কার্টিং ও ডিজাইনের পোশাক পরিধান বাধ্য করা হয়নি। তবে ইসলাম পোশাকের কিছু উদ্দেশ্য ও মৌলিক সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে, যেগুলো সকল যুগে সবার জন্যই মেনে চলা সম্ভব। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পোশাকের কোন কাঠামো নির্ধারণ করে দেননি। রাসূলুল্লাহ স. নিজেও বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরেছেন। তিনি তার উম্মতকে বিশেষ কোন পোশাক পরতে উৎসাহিত করেননি। হাদীসে এমন কোন পোশাকের উল্লেখ পাওয়া যায়নি, যার জন্য বিশেষ সাওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে শুধুমাত্র পোশাকের ব্যবহার ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু মৌলিক সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ নীতিমালা মেনে চললে যেকোন কাঠামোর ও পরিমাপের পোশাক পরা যেতে পারে।

৫. নারী পোশাকের অন্যতম অনুষঙ্গ হিজাব

মুসলিম নারী পোশাকের অন্যতম অনুষঙ্গ হিজাব। এটি নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিন্যাস ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক মহান ব্যবস্থা এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক বিধান। পবিত্র কুরআনের সূরা আন নূরের ৩০, ৩১ ও ৬০ নং এবং সূরা আল আহযাবের ৩২, ৩৩, ৫৩ ও ৫৯ নং আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে এবং সূরা আন নূরের ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াতে পরোক্ষভাবে হিজাবের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সিহাহ সিত্তাসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে হিজাব সম্পর্কিত সত্তরটির অধিক হাদীস স্থান পেয়েছে। হিজাব ব্যবস্থা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। পারিভাষিক অর্থে হিজাব নারী পোশাকের উপর কেন্দ্রীভূত হলেও পোশাক ও নারীর মধ্যেই ইসলামের হিজাব ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক, যাতে নারী-পুরুষ উভয়ের কম-

বেশি অংশীদারিত্ব রয়েছে। তবে হিজাবের প্রধান অনুষঙ্গ পোশাকের বিষয়টি নারীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তা সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর দেহ বড় চাদর কিংবা বোরকা সদৃশ ঢিলেঢালা পোশাক দ্বারা পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে চলার যে পদ্ধতি বা ব্যবস্থা সাধারণ মুসলিম সমাজে সেটিই হিজাব বলে পরিচিত। যদিও হিজাব শুধুই এক টুকরো কাপড় নয়, কিংবা শুধুই কেবল শরীর ঢেকে রাখার নাম নয়, বরং হিজাব একটি মনোদৈহিক বিষয়। হিজাব একটি চেতনার নাম। ইসলামে হিজাব ব্যবস্থা মূলত সমাজ ব্যবস্থারই অংশ। বোরকা, নিকাব, চাদর, স্কার্ফ, জিলবাব ইত্যাদি হিজাব প্রতিপালনের সহায়ক পোশাক মাত্র। হিজাব একটি সামগ্রিক নৈতিক ব্যবস্থাপনা, যা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই অবশ্য পালনীয়। এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনাগত দিকও রয়েছে।

ইসলামী ঐতিহ্যে পোশাকের দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ স. এর পোশাক: রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা অনুসরণ করে সেই ধরন ও ডিজাইনের পোশাকই পরতেন, যা তাঁর সময়ে স্বীয় দেশ ও জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে আরব দেশে পুরুষরা সাধারণত ইযার (লুংগি), কামীস, জুব্বা, আবা, পাগড়ী এবং মহিলারা ইযার, কামীস, জিলবাব, ওড়না প্রভৃতি পরিধান করতো। তাছাড়া পুরুষদের মধ্যে ইয়েমেনী চাদর ও পশমী জুব্বার প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ স. ইযার পরতেন, জামা পরতেন, গায়ে চাদর জড়াতেন, মাথায় টুপি ও পাগড়ী বাঁধতেন। এ কাপড় সমূহের অধিকাংশই ছিল মামুলি ধরনের ও সূতির। তবে কখনো তিনি সুন্দর ইয়েমেনী চাদরও পরেছেন , যা তৎকালীন সৌখিন আরবরাই পরতো। রাসূলুল্লাহ স. এর পোশাক ও দেহ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যাবে শামায়িলি রাসূল জাতীয় গ্রন্থসমূহে। এসবের মধ্যে শামায়িলি তিরমিযী খুবই প্রসিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ স. কামীস খুব পছন্দ করতেন। উম্মু সালামা রা. বলেন,

كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ القميص

রাসূলুল্লাহ স.এর সবচেয়ে প্রিয় কাপড় ছিল কামীস (Al-Tirmidī 1417H, 1762)।

শরীরের মাপে কেটে ও সেলাই করে শরীরের ঊর্ধ্বাংশের জন্য প্রস্তুত সকল পোশাককেই আরবীতে কামীস বলা হয়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, কামীস পরিহিত অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ স. ইন্তিকাল করেন (Jahangir 2007, 136)। তিনি বিভিন্ন সময় জুব্বা পরিধান করতেন বলে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। বিশেষত জুম'আর দিনে বা সম্মানিত মেহমানদের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি জুব্বা বা কাবা পরিধান করতেন। নবী করীম স. সবুজ রং বেশি পছন্দ করতেন, তবে তাঁর অধিকাংশ পোশাক ছিল সাদা। লাল রং ব্যবহারে তিনি আপত্তি করেছেন বলেও বর্ণিত আছে। তিনি মিশ্র রং এর পোশাক 'হিবারা' পরেছেন। ইয়েমেনের তৈরি একাধিক রঙের ডোরা কারুকার্যখচিত চাদরকে 'হিবারা' বলা হয়। কেউ কেউ এর মূল রং সবুজ বলে

উল্লেখ করেছেন। নবী করিম স. এর জুতার উপরে দু'টি ফিতা লাগানো থাকতো, যাতে তিনি তাঁর আংগুল মুবারক স্থাপন করতেন। তিনি মোজা পরতেন এবং মোজার উপর মাসেহ করতেন। তাঁর বালিস ছিল চামড়ার খোলের তৈরি। ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি করা থাকতো। আবার কখনো খালি বিছানায় শয়ন করতেন।

রাসূলুল্লাহ স. তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যের পোশাক ব্যবহার করেছেন। সাধারণভাবে তিনি স্বল্পমূল্যের পোশাক ব্যবহার করতেন। বিদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের সময় ও বিভিন্ন উপলক্ষে মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। কেউ মূল্যবান পোশাক উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর প্রিয় পোশাক ছিল কামীস। অন্য হাদীসে আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ يلبسها الحبرة

রাসূলুল্লাহ স. হিবারা (ইয়েমেন দেশীয় বিভিন্ন বর্ণের ডোরাযুক্ত সূতী কাপড়) পরতে অধিক পছন্দ করতেন (Al-Tirmidī 1417H, 1787)।

আসমা বিনত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, একদা তিনি সূচীকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের করলেন, যা রেশম দ্বারা নকশী করাছিল এবং তার গলা ও বুকের পট্টিগুলো রেশম দ্বারা জড়ানো ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, এটা রাসূলুল্লাহর স. জুব্বা, যা আয়িশা রা. এর কাছে ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর আমি তা লাভ করি। রাসূলুল্লাহ স. তা পরিধান করতেন। এখন আমরা একে ধুয়ে এর পানি দ্বারা রোগমুক্তি কামনা করি (Muslim 2006, 2/190)।

ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان رسول الله ﷺ يلبس قميصًا قصير اليدين والطول

রাসূলুল্লাহ স. স্বল্পদৈর্ঘ্য জামা পরিধান করতেন, যার হাতাদ্বয় সংকীর্ণ হতো (Ibn Mājah 2014, 3587)।

ইবন আব্বাস রা. আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এর তিনটি টুপি ছিল। একটি ছিল মিশরীয় সাদা টুপি, (এটিই তিনি সাধারণত পরতেন)। আরেকটি ছিল ডোরাকাটা ইয়েমেনী চাদরের টুপি। অপরটি ছিল কানটুপি, যা তিনি সফরের সময় পরতেন (Ibn al-Jawzī 1997, 567-568)।

পায়জামা সম্পর্কে 'রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'হে লোকেরা তোমরা পায়জামা তৈরি করে নাও। কেননা এটি সতরের জন্য অধিকতর উপযোগী কাপড় ('Abdul'Aziz 1403H, 267)।

চাদর পরিধান সম্পর্কে জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. দু'ঈদে ও জুম'আয় পাগড়ী বাঁধতেন ও লাল চাদর পরতেন।' আনস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার 'রাসূলুল্লাহ সা. অসুস্থ ছিলেন। তখন তিনি উসামা রা. এর উপর ভর করে বের হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর গায়ে একটি কাতারী (ইয়েমেনী) চাদর ছিল, যা তিনি উভয় কাঁধে জড়িয়ে পরেছিলেন এবং এ অবস্থায় তিনি লোকদের নিয়ে সালাত

আদায় করলেন (Awqāf 1995, 6/138)।'

সাহাবীগণের রা. পোশাকের দৃষ্টান্ত : রাসূলুল্লাহর স. সম্মানীত সাহাবীগণ জীবনের সকল দিকের মত পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধি নিষেধ অকপটে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পোশাকে গর্ব-অহংকার ও অপচয়ের লেশমাত্রও লক্ষ্য করা যায়নি। বিশিষ্ট সাহাবী ও সাধারণ সাহাবীগণের পোশাকে মান ও দামের দিক থেকে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। সাহাবীদের মধ্যে প্রায় সবাই সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর পোশাক পরিধান করতেন।

আনাস ইবন মালিক রা. বলেন, উমর রা. যখন খলিফা ছিলেন সে সময় আমি তাকে দেখেছি যে, তিনি তার পোশাকটি দু'কাধে তিন তালি দিয়ে নিয়েছেন। একটির উপর আরেকটি তালি দিয়েছেন (Mālik 1406H, 2/918)।

তিনি আরো বলেন, আমি উমর রা. এর জামার ঘাড়ে চারটি তালি দেখেছি। একবার তিনি জুম'আর নামাযে খানিকটা দেরি করে আসলেন। মিম্বারে উঠার পর উপস্থিত লোকজন দেরি করার কারণ জানতে চাইলো। জবাবে তিনি বললেন, 'আমার একটি মাত্র জামা, তাই শুকাতে দেরি হয়ে গেছে।'

সাহাবীদের পাগড়ী পরিধান বিষয়ে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবিয়ী মিলহান ইবন সাওবান বলেন, '(খলিফা উমর ইবন খাত্তাবের রা. সময়ে) আম্মার ইবন ইয়াসীর রা. এক বছরের জন্য কুফায় আমাদের গভর্নর ছিলেন। তিনি প্রতি শুক্রবারে জুমআ'র সালাতে একটি কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় আমাদের খুতবা প্রদান করতেন (Al-Baihaqī 2003, 3/246)। আবু বকর রা. সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, তিনি সাধারণত, আবা নামক এক প্রকার ঢিলেঢালা জামা পরতেন।

আলিম ও জনসাধারণের পোশাকে পার্থক্যের সূচনা : ইতিহাস থেকে জানা যায়, সাহাবীদের যুগ থেকে পরবর্তী প্রায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত আলিম ও সাধারণ মুসলমানদের পোশাকে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে আনুমানিক ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের পর আলিম ও সাধারণ মুসলমানদের পোশাকে ভিন্নতা দেখা দেয়। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের হাতে ভারতীয় মুসলিম শাসকদের পরাজয়ের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আরম্ভ হয়। এ সময় মুসলমানদের তাহযীব তমুদ্দুন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে। তাই বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে মুসলিম আলিম সমাজের স্বকীয়তা রক্ষার মত ভালো চিন্তা থেকেই আলিমদের পোশাকে ভিন্নতার সূচনা করা হয়। যেহেতু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান পুরোহিতদের আলাদা পোশাক রয়েছে, তাই মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরও আলাদা পোশাক থাকতে হবে, এ ধারণাটিও এর পেছনে কাছ করেছে। আর তখন থেকে ভারতীয় আলিমদের পোশাককে ইসলামী পোশাক নামে আখ্যায়িত করার প্রবণতা দেখা দেয়। ভারতীয় আলিমদের জন্য নির্ধারিত পোশাককে নামাযের জন্য উপযুক্ত ও উত্তম পোশাক বলতে কোন দ্বিধা নেই। তবে রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবা কিরাম রা.

জনসাধারণ থেকে ভিন্ন ধরনের কোন পোশাক পরিধান করতেন না। আরবদের মধ্যে এখনো সাধারণ মুসলমান ও আলিমদের পোশাকের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই।

জাতীয় পোশাক নির্ধারণে কতিপয় সুপারিশমালা

১. পোশাক প্রশ্নে আমাদের দেশে সংকীর্ণতা ও বাড়াবাড়ি দু'ধরনের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। উভয়টিই ইসলামের সঠিক আদর্শ লালনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। তাই পোশাক বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ তুলে ধরার জন্য ব্যাপকহারে সভা, সেমিনার ও লেখনীর মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরী।

২. দেশের মানুষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় চেতনার সমন্বয়ে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা সময়ের অপরিহার্য দাবি। তাই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় পোশাক নির্ধারণবিষয়ক একটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

৩. ইসলাম নিষিদ্ধ পোশাক ও ডিজাইন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্যই অকল্যাণকর। তাই একটি মুসলিম দেশ হিসেবে ড্রেসকোড নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

৪. আমাদের তরুণ-তরুণীদেরকে অশালীন ও শর্টকাট পোশাক ব্যবহারে প্ররোচিত করার জন্য ফ্যাশন ডিজাইনার প্রতিষ্ঠানগুলোই বেশি দায়ী। তাই উদ্ভট ও অশালীন ডিজাইন রোধে সেন্সরশীপ আরোপ করা উচিৎ।

৫. তরুণ-তরুণীদের পোশাক ব্যবহারে বিদেশী সংস্কৃতির অনুসরণ রোধ করার জন্য ব্যাপকহারে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

জাতীয় পোশাক যেকোনো দেশের সাংস্কৃতিক নানা বৈচিত্র্যের মাঝেও নিজেদের ঐকতান খুঁজে পেতে সহায়তা করে। এটি জাতীয় ঐক্যকে আরো সমৃদ্ধ ও শাণিত করে। তাই একটি ঐতিহ্যবাহী জাতি হিসেবে আমাদেরও একটি জাতীয় পোশাক থাকা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। নারী পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট উদারতার পাশাপাশি এমন কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা সভ্যতা ও শালীনতা রক্ষায় একান্ত আবশ্যক। ইসলামের সেই মূলনীতিগুলো পালন করে যেকোন পোশাক-ই পরিধান করা বৈধ। পোশাক প্রশ্নে এ হলো ইসলামের ব্যাপকতম গ্রহণযোগ্য নীতি। তথাপি এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও পোশাকে ঐক্য থাকবে কেবল আল্লাহ ও তাঁর দেওয়া মূলনীতি অনুসরণের মধ্যে। এ মূলনীতিকে সামনে রেখে ও জাতীয় অন্যান্য সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে একটি সমন্বিত জাতীয় পোশাক নীতি গ্রহণ করলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা যায়।

Bibliography

‘Abdul‘Aziz, Muhammad. 1403H. *Al-Libās wa al-Zīnat Fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasat Risālah.

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash‘as. 1420H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Ahmad ‘Alī. 2005. *Islamer Dristite Poshak (Dress in the light of Islam)*. Chittagong: Pioneer Trust.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Ahmad bin Hussain. 1423H. *Shu‘ab al-Imān*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Ahmad bin Hussain. 2003. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘īl. 2002. *Al-Jamī‘ Al-Sahīh (In 1 Vol)*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Hākim, Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn ‘Abdullah. 1990. *Al-Mustadrak‘Alā al-Sahīhain*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Haythamī, Abū al-Hasan ‘Alī ibn Abū Bakr. 1994. *Majma‘ al-Zawā’id wa Manba‘ al-Fawā’id*. Cairo: Maktabah al-Qudsī

‘Alī Qārī, Mollā‘Alī Sultān. 2002. *Mirqāt al-Mafātīh Sharh Mishkāt al-Masābīh*. Beirut: Dār al-Fikr.

‘Alī, Jawwād. 1971. *Al-Mufassal Fī Tārikhi al-‘Arab Qabl al-Islām*. Beirut: Dār al-‘Ilm lil-Malāyīn.

Al-Rafa‘yī, Muhammad Nasib. 1410H.*Taisīr al-‘Ali al-Qadīr*. Riyadh: Maktabaul Ma‘ārif.

Al-Tirmidī, Abū ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa. 1417H. *Al-Sunan (In 1 Vol.)*. Riyadh: Maktabat al-Ma‘ārif.

Asiatic Society. 2005. Banglapedia. Dhaka: Asiatic Society.

Assaf, Ahmad Muhammad. 1988. *Al-Halāl wa al-Harām Fī al-Islām*. Beirut: Dār Ihya al-‘Ulum.

Awqāf, Kuwait Ministry of Awqāf and Islamic Affairs.1995. *Al-Mawsuah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Ministry of Awqāf and Islamic Affairs.

Chakrabarti, Ratan Lal & Shahnewaz, A. K. M. 1997. *Bangladesh O Prachin Bishyasovvotar Itihas (History of Civilization of Bangladesh and Ancient World*. Dhaka: National Curriculum and Textbook Board.

Ibn al-Jawzī. 1997. *Al-Wafā’ bi-ahwāl al-Mustafā*. Lahore: NP.

Ibn Daqīq, al-‘Eid. ND. *Ihkām al-Ahkām Sharh ‘Umdat al-Ahkām*.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazīd. 2014. *As-Sunan*. Beirut: Dār al-T’sīl.

Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn‘Abd al-Halīm. 1995. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Al-Madīnah al-Munawwarah: King Fahad Complex for the printing of the Holy Quran.

Ibrāhīm, Muhammad Ahmad. 2007. *Tatawur al-Malābis fī al-Mujtama‘ al-Misrī*. Qairo : Maktabat Madbulī.

Jahangir, Khandaker Abdullah. 2007. *Qur'an-Sunnaher Aloke Poshak, Porda O Deho-Sojja (Dress, Hijab and tidiness in the Light of the Qur'an and Sunnah)*. Jhenidah: As-Sunnah Pablications.

Lutfī, Sāmiyah Ibrāhīm & ‘Alī, ‘Ijja Ibrāhīm. 1992. *Tārikh wa Tatawur al-Malābis ‘Abr al-‘Usur*. Alexandria: University of Alexandria.

Mālik bin Anas bin Mālik. 1406H. *Muwatta*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.

Mohiuddin, AFG. 2016. “Amader Jatiya Poshak (Our National Dress)”. *Daily Amadesr Somay*. February 4.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qushairī Al-Nishapūrī. 2006. *Al-Musnad al-Saḥīḥ (In 1 Vol)*. Riyadh: Dār Ṭayyiba.

Mustafa, Ibrahim, Az-ziat, Ahmad, Abdul Qadir, Hamid & An-najjar, Muhammad. 2004. *Al-Mujam Al-Wasit*. Qairo: Maktabah As-shuruq ad Dualiyyah.

Qal‘ajī, Muhammad Rawyas. 1989. *Mawsu‘atu Fiqh Umar*. Beirut: Dār al-Nafāis.

Sangram, The Daily Sangram. 2011. “Turasker Akti Sarkari Bishyabiddalaye Hijabdhari Chatrider Degree Lav (Graduation of Hijabi Female Students in a Government University of Turkey). June 22.